এগুলির মালিক হিন্দু-মুসলমান দুই-ই ছিল। লুট হতে থাকলো এগুলি। হিন্দু দোকানের সাথে কিছু মুসলমান দোকানও লুট হলো। এজন্য পরে দেখা গেল, অনেক দোকানে বড় বড় করে লেখা 'এটা মুসলমানের দোকান'। কিন্তু লুটপাটকারীদের কাছে কিবা হিন্দু কিবা মুসলমান।

আব্বার কাছে লুটের একটা গল্প শুনেছিলাম। আগে ঢাকায় প্রতি বছর নিয়মিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হতো। চকবাজারে মুসলিম লীগ নেতা মওলানা দীন মুহম্মদের একটা দোকান ছিল। তিনি থাকতেনও সেখানে। উর্দুতে কথা বলতেন। একবার দাঙ্গার সময় তাঁর দোকানও ঐ পাড়ার মুসলমানরা লুট করলো। মওলানা দীন মহম্মদ বেশ বিস্ময় প্রকাশ করে আব্বাকে বললেন, 'হাশিম সাহেব, ব্যাপারটা কিছুই বুঝলাম না। দাঙ্গা শুরু হওয়ার আগের দিন সন্ধ্যাতেই আমি চকবাজারে এক ইসলামী জলসায় ওয়াজ করলাম। তাতে অনেক লোক জড়ো হয়ে রাত পর্যন্ত আমার ওয়াজ শুনলো। খবর পেলাম যারা ওয়াজ শুনছিলো তাদের মধ্যে থাকা লোকজনই আমার দোকান লুট করেছে।' আব্বা হাসতে হাসতে তাঁকে বললেন, 'এতে তাজ্জব হওয়ার কিছু নেই। রাত্রে আপনি যখন ওয়াজ করছিলেন তখন তারা সওয়াব লুটছিলো। পরদিন দাঙ্গা লাগলে সেই সুযোগে তারা হাতের কাছে যা পেলো তা-ই লুট করলো। তারা লুটেরা এবং এটাই হলো লুটেরাদের স্বভাব।'

রিপন স্ট্রীটের বাড়ীতে যারা ছিল তাদের মধ্যেও কেউ কেউ রাস্তায় বের হয়ে লুটে অংশ নিল অথবা লুটের ভাগ পেলো। দেখা গেল, এই লুটের সামগ্রীর মধ্যে জ্যাম, জেলির বোতল, মাখনের টিন, বিস্কুট ইত্যাদি। তখন এমন অবস্থা যে লুটের এই সব জিনিস ফেরৎ দেওয়ারও উপায় নেই। দোকানের মালিকরা উধাও এবং খাবার জিনিসের দোকানপাট বন্ধ।

কলকাতায় মন্নুজান হোস্টেল নামে ছাত্রীদের জন্য একটি হোস্টেল ছিল বিবেকানন্দ রোডে। সেখানে থাকা তাদের জন্য বিপজ্জনক ছিল। এজন্য মুসলিম লীগ স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ পাঠিয়ে গাড়ি করে তাদেরকে আমাদের রিপন স্ট্রীটের বাড়ীতে নিয়ে আসা হলো। একটা বড় হলঘর ছিল। সেই ঘরেই মেয়েদের সকলের এক সাথে থাকার ব্যবস্থা হলো। তখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন মোয়াজ্জেমুদ্দীন হোসেন। তিনি এলেন। এতগুলি মানুষের খাওয়ার মতো কিছুই ছিল না। এজন্য তিনি চাল, ডাল, তেল, কেরোসিন ইত্যাদির ব্যবস্থা করলেন। কোনরকমে খাওয়া-দাওয়া চলতে থাকলো।

অন্যদিকে চলতে থাকলো আর এক ব্যাপার। বাড়ীর মধ্যে তখন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে মওলানা আজাদ কলেজ) সহ অন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র লীগের ছেলেরা ও প্রায় পঁচিশ-তিরিশ জন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী একত্রে থাকায় এক রোমান্টিক আবহাওয়া সৃষ্টি হলো। পরের দিকে ঐ ছেলেদের কয়েকজনের সাথে কয়েকজন মেয়ের বিয়েও হলো। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নূরুদ্দীন আহমদ, যশোহরের কমরেড আবদুল হকের ছোট ভাই আবদুল হাই, নোয়াখালীর আবদুল জলিল প্রভৃতি।

দাঙ্গা চলতে থাকার সময় কয়দিন ধরেই আমাদের বাড়ীতে লোকজনের আসা-যাওয়া অনেক বেড়ে গেল। মুসলিম ছাত্র লীগের কর্মী ছাড়াও মুসলিম লীগের অন্য লোকরাও এর মধ্যে ছিলেন। দাঙ্গার নানা রকম খবর এঁরা আনতে লাগলেন। আমার মনে আছে, এক সন্ধ্যায় শেখ মুজিবুর রহমান খুব উত্তেজিতভাবে এমন সব কর্ম করার কথা বলছিলেন যা শুনে আমার খুব অবাক লাগলো। আমার বয়স তখন অল্প হলেও কিছু বোঝার ক্ষমতা তো ছিল। আব্বাকে বললাম, আপনাদের লোক এসব কি বলছেন? তিনি বললেন, ওর কথা বাদ দাও। ও ওই রকম করেই কথা বলে।

আমাদের রিপন স্ট্রীটের বাড়ীর কাছেই ১৫নং আলিমুদ্দীন স্ট্রীটে ছিল আমার মেজ খালার বাড়ী। বাইরে থেকে লোক আসা যাওয়া করলেও আমাকে বাড়ীর গেট থেকে একশো ফুট পার হয়ে রাস্তায় যেতে নিষেধ করা ছিল। কাজেই খালার বাড়ী যাওয়ার প্রশ্ন ছিল না। তবে গেটের সামনে দাঁড়ালে রাস্তার ওপর লোকজনের দৌড়াদৌড়ি দেখা যেত। আল্লাহু আকবর ইত্যাদি চীৎকার শোনা যেত ঘরের ভেতর থেকেও।

আব্বার কাছে তখন সিদ্দিক নামে একটি ছেলে কাজ করতো। তার বয়স ছিল ১৭/১৮ বছর। বাড়ী ছিল ঢাকার ঘোড়াশাল এলাকার এক গ্রামে। পালিয়ে কলকাতা গিয়ে প্রথমে মুসলিম লীগের ৩নং ওয়েলেসলী ফার্স্ট লেনের অফিসে কাজ নিয়েছিল। পরে তাকে আব্বার কাছে দেওয়া হয় কাজের জন্য। সিদ্দিক রান্না থেকে নিয়ে আব্বার সব রকম দেখাশোনা ও যত্ন করতো। দাঙ্গার কদিন আমাদের বাড়ীতে অন্তত ৫০/৬০ জনের রান্না করতে হতো। মূলত সিদ্দিকই সে সব কাজ করতো, তবে তাকে সাহায্য করার লোকও নিশ্চয় ছিল। আমার সেটা মনে নেই। মনুজান হোস্টেলের মেয়েদেরকে হল ঘরের বাইরে আসতে নিষেধ করায় তাঁরা সেখানেই থাকতেন। কিছু তরিতরকারী কাটাকুটিতে হয়তো সাহায্য করতেন। কিন্তু তখন তরিতরকারী বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। আলুই সম্বল।

দেশ ভাগ হওয়ার পর সিদ্দিক আমাদের বর্ধমানের বাড়ীতে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ছিল। তার পর ঢাকায় এসে সে অনেক দিন মওলানা আকরাম খানের 'আজাদ' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের বিল কালেক্টর হিসেবে কাজ করে। কাজ পেতে তার কোনো অসুবিধে হয়নি, কারণ মুসলিম লীগ মহলে তার ব্যাপক পরিচিতি ছিল। বাঙলাদেশ হওয়ার বেশ কিছুদিন পর তার সাথে দেখা হয়। তার মধ্যে কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য করে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং নিজেদের ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হয়। আব্বা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন প্রায়ই আমাদের ঢাকার বাড়ীতে আসতো। এখনো অনেক দিন পর পর এসে উদয় হলে দেখা হয়। তার কাছে শুনেছি সে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিল এবং এখনো আওয়ামী লীগেই আছে।

আমার মেজ মামু সৈয়দ মহীউদ্দীন শাকের সাহেব চাকরী করতেন ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে। থাকতেন কলকাতায়। আগস্টের ২০/২১ তারিখের দিকে তিনি খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য আলিমুদ্দীন স্ট্রীটে আমার খালার বাসায় এবং আমাদের রিপন

স্ট্রীটের বাসায় এলেন। আমার ছোট ভাই শাহাবুদ্দীন দাঙ্গার পরিস্থিতিতে রিপন স্ট্রীটের বাড়ীতে আটকা পড়ে বেশ কাহিল অবস্থায় ছিল। তার কোন সঙ্গী সাথীও ছিল না, বিশেষ কিছু বোঝার মতো বয়সও ছিল না। আব্বা মামুকে বললেন, তাকে নিয়ে আলিমুদ্দীন স্ট্রীটের বাসায় পৌছে দিতে। আমি রিপন স্ট্রীটেই থাকলাম।

এই সময় একদিন আমি অন্য কোন একজনের সাথে বাড়ী থেকে প্রথম রাস্তায় বের হলাম। তখন দাঙ্গার সেই উগ্রমূর্তি আর নেই। অল্প-স্বল্প লোক চলাচল করছে। কিন্তু দাঙ্গার উগ্রমূর্তি না থাকলেও দাঙ্গার বীভৎসতা রাস্তায় ছড়ানো ছিল। পচা গন্ধ। রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহ। ওয়েলেসলীর মাথা থেকে লোয়ার সার্কুলার রোডের মাথা পর্যন্ত পুরো রিপন স্ট্রীটে আমি নটা লাশ দেখেছিলাম। তার মধ্যে একটি লাশ পড়েছিল ঠেলাগাড়ীর মত ময়লা ফেলার গাড়ীতে। মুখ দেখা যাচ্ছিলো না, পা দুটো বাইরের দিকে বেরিয়ে ছিল। আর একটা লাশ পড়েছিল রাস্তার এক পাশে উপুড় হয়ে। তার মাথার পেছন দিকটা খুব বড় করে কাটা, মনে হয় কসাইদের ছুরি বা ঐ জাতীয় কোন ধারালো জিনিষ দিয়ে। মাথায় টিকি দেখে বোঝা গেল রিকশাচালক। 'আল্লাহু আকবর' বলে বেচারা গরীবকে মুসলমানরা এভাবেই খুন করেছিল। একটা শুয়োরের মৃতদেহও রাস্তার ওপর এক পাশে দেখলাম পড়ে থাকতে। দাঙ্গার সময় 'হারাম' জানোয়ারেরও নিস্তার ছিল না।

কলকাতার দাঙ্গার জন্য কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে মুসলিম লীগ ও সোহরাওয়ার্দীকে দায়ী করা হলো। আজ পর্যন্ত কলকাতায় হিন্দু সমাজের একজনকেও আমি পাইনি যিনি বিশ্বাস করেন যে, সোহরাওয়ার্দী দাঙ্গার জন্য দায়ী ছিলেন না। কিন্তু আসলে দাঙ্গা বাধানোর ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দীর কোন ভূমিকা ছিল না। তিনি একজন উদারনীতিক বুর্জোয়া ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষ বসুর সাথে কলকাতায় রাজনীতি করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের অনেক প্রতিক্রিয়াশীল দিক নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর লোক তিনি ছিলেন না। শুধু তাই নয়, তিনি সে সময় নিজের জীবন বিপন্ন করেও দাঙ্গা বন্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। দাঙ্গার প্রথমদিকে ভবানীপুরে তিনি একবার যখন দাঙ্গাবাজ হিন্দুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন তখন ঘটনাচক্রে কমিউনিস্ট পার্টির কিছু লোক তাঁকে কোন রকমে রক্ষা করেন।

দাঙ্গার জন্য সোহরাওয়ার্দীকে দায়ী করার একটা বাস্তব কারণ ছিল। ১৬ই আগস্ট তিনি সরকারী ছুটি ঘোষণা করেন। এটা ছিল তাঁর এক মারাত্মক ভুল এবং নিজের কেবিনেট অথবা মুসলিম লীগের প্রাদেশিক কমিটি কারও সাথে পরামর্শ না করেই তিনি একাজ করেছিলেন। আসলে এই দাঙ্গা বাধাবার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার ভূমিকাই ছিল প্রধান। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল হিন্দু মহাসভা এবং সেই সাথে মুসলিম লীগের নিম্নস্তরের কিছু লোক। অনেকে এ ব্যাপারে মুসলিম লীগ নেতা কলকাতার করপোরেশনের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র ওসমানকে সন্দেহ করতেন। কংগ্রেস অথবা মুসলিম লীগ কারও কোন লিপ্ততা (involvement) এতে ছিল না। দাঙ্গার ওপর যে তদন্ত কমিটি হয়েছিল তাতে সাক্ষী দিতে গিয়ে আব্বা বলেছিলেন যে, দাঙ্গা বাধানো যদি মুসলিম লীগের কাজ হতো তা হলে আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম

লীগের সাধারণ সম্পাদক আমার দুই নাবালক ছেলেকে কলকাতা ময়দানের বিশাল জনসভা দেখাবার জন্য বর্ধমান থেকে কলকাতায় নিয়ে আসতাম না।

আমার জন্য কলকাতার এই দাঙ্গার সময়কার একটা বড় স্মরণীয় ঘটনা ছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন নামে পরিচিত বিখ্যাত রাজনৈতিক ঘটনার নেতাদেরকে প্রথমবারের মতো আমাদের বাড়ীতে দেখা। আব্বা বরাবরই ছিলেন নিরাপত্তা আইন, রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরকে জেলে আটকে রাখা ইত্যাদির বিরোধী। তাছাড়া সে সময় কমিউনিস্ট পার্টির সাথেও তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কাজেই তিনি প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সাথে চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠন মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মুক্তির ব্যাপারে আলাপ করেছিলেন। সোহরাওয়ার্দী তাতে সম্মত হয়ে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিতে তাঁদের মুক্তির প্রস্তাব করলে সেটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলকাতা দাঙ্গার মাত্র দু'দিন আগে ১৪ আগস্ট সোহরাওয়ার্দী ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলে আটক চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় আটক নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। একমাত্র লোকনাথ বল ছাড়া তাঁরা সকলেই তখন কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্কিত হয়েছিলেন। মুক্তির আগে তাঁদের সাথে কথা বলার জন্যই সোহরাওয়ার্দী এক বিশেষ সরকারী সফরে ঐ সময় ঢাকা এসেছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর সাথে এই সাক্ষাৎকারের কথা আমি কমরেড সুখেন্দু দস্তিদারের কাছেও পরে শুনেছিলাম। তিনি ছিলেন ঐ রাজনৈতিক বন্দীদের একজন। কিছুদিন আগে তাঁদের সকলকে আন্দামান থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলে নিয়ে আসা হয়েছিল।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কথা, বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে সেই বিরাট ঔদ্ধত্যপূর্ণ সশস্ত্র আক্রমণের কথা, তার নেতা সূর্য সেন, অনন্ত সিংহ, গনেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রভৃতির কথা আমি প্রথম শুনেছিলাম ১৯৪৫ সালে তৎকালীন ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুদ্দীন আহমদের কাছে। সে সময় তাঁর সাথে আমি ঢাকায় বেড়াতে এসেছিলাম। পরে এর ওপর কল্পনা দত্তের (যোশীর) বই পড়েছিলাম। আরও পরে সত্তরের দশকে পড়েছিলাম অনন্ত সিংহ-এর তিন খণ্ডে লেখা বই 'চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে'র প্রথম দুই খণ্ড।

এটা ছিল খুব সম্ভবত আগস্টের ২১/২২ তারিখ। বর্ধমান থেকে আমার চাচা, আব্বার মামাতো ভাই, আবদুল আহাদ সাহেব কলকাতা এসেছিলেন বিশেষ করে আমাদের দুই ভাইকে বর্ধমান নিয়ে যাওয়ার জন্য। যাওয়ার সময় ছিল সকালের দিকে, কিন্তু খবর এলো যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতারা ঐ দিন সকালের দিকেই আমাদের বাসায় আসবেন। তাঁরা আগের দিন সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছেছিলেন জাহাজে করে। খবরের কাগজে ওই দিন সকালে তাঁদের গ্রুপ ছবিসহ রিপোর্টও বের হয়েছিল।

সকালে আসার কথা থাকলেও তাঁদের দেরী হচ্ছিলো। এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে ট্রেনে যাওয়াও তখন বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, এ জন্য চাচা ব্যস্ত হচ্ছিলেন। কিন্তু তবু আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। অনেক দেরী দেখে শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো

আমরা হাওড়া স্টেশনের দিকে রওয়ানা হবো। এটা ঠিক হওয়ার পর কামরা থেকে বের হয়ে বাড়ীর গেটের সামনেই হঠাৎ দেখি তাঁরা। গেটের ভেতর দিয়ে বাড়ীতে ঢুকছেন। তাঁদের ছবি কাগজে বের হওয়ায় চেনার অসুবিধে হয়নি। সে এক মহা উত্তেজনা। অনন্ত সিংহ, গনেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী এই তিন জনকে আমার মনে আছে, কিন্তু আরও কয়েকজন ছিলেন। আব্বা যেহেতু তাঁদের মুক্তির ব্যাপারে চেষ্টা করেছিলেন সেজন্য কলকাতায় এসেই পরদিন তাঁরা তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। মনে হয় আমাদের বাড়ীতে আসার আগে তাঁরা গিয়েছিলেন সুহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে দেখা করতে। মুক্তি তাঁদের জন্য একটা বড়ো আনন্দের ব্যাপার ছিল, কিন্তু মুক্তির সময় কলকাতার দাঙ্গা পরিস্থিতি তাঁদের জন্য ছিল এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

আব্বার সাথে তাঁরা কথাবার্তা বলতে থাকার কিছুক্ষণ পর চাচা বললেন দেখা তো হয়েছে, এবার যেতে হবে। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও জরুরী পরিস্থিতিতে দিনে দিনে বর্ধমান পৌঁছানোর জন্য আমরা হাওড়ার দিকে রওয়ানা দিলাম। তখনকার ট্রেনের কামরার ভেতরের অবস্থা এখনো মনে পড়ে। চারিদিকে থমথমে ভাব। ট্রেনের কামরাতেও তাই। কেউ কারও সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলছে না। দাঙ্গা যেন মানুষকে একেবারে অবশ করে দিয়েছে।

কলকাতার দাঙ্গায় মৃতদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাই ছিল অনেক বেশী। তার মধ্যে বেশ বড়ো সংখ্যক ছিলেন খিদিরপুরের ডক শ্রমিক যাদের অধিকাংশের বাড়ী ছিল নোয়াখালী জেলায়। এর প্রতিক্রিয়ায় ২৯ শে আগস্টের দিকে নোয়াখালী জেলায় যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মওলানা গোলাম সরওয়ার নামে এক লোক ৭ই সেপ্টেম্বর নোয়াখালীর মৌলভীদের এক সভায় কলকাতায় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুসলমানদের উত্তেজিত করে দাঙ্গা বাধিয়ে দিল। নোয়াখালীর অনেক এলাকা জুড়ে দাঙ্গা ছড়িয়ে গেল। এর ফলে অনেক হিন্দু নিহত এবং ঘরবাড়ী থেকে উচ্ছেদ হলেন। নোয়াখালীর পর ২৩ শে সেপ্টেম্বর শুরু হলো বিহারের পাটনায় দাঙ্গা। এই দাঙ্গায় বিপুল সংখ্যায় মুসলমানরা নিহত হলেন, উদ্বাস্তু হলেন হাজার হাজার। নোয়াখালী দাঙ্গায় হিন্দুরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু কলকাতা ও বিহারের দাঙ্গায় মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন বেশী।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি গান্ধীজী নোয়াখালীর দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সফর শুরু করেন। সেই সময় নোয়াখালীর দত্তপাড়ায় সোহরাওয়ার্দী তাঁর সাথে দেখা করেন। কলকাতা থেকে রওয়ানা হওয়ার আগেও গান্ধীর সাথে মুসলিম লীগ নেতাদের যোগাযোগ হয়েছিলো। প্রাদেশিক সরকার সফরের সময় তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন। গান্ধীর এই সফরের সময় সর্বক্ষণ তাঁর সাথে থাকতেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী আবদুর রশীদ সাহেব। তিনি ছিলেন আমার চাচা, আব্বার মামু-আবদুল মোমিন সাহেবের বড় ছেলে এবং বীরভূম থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য। গান্ধী কয়েক সপ্তাহ ধরে নোয়াখালী সফর করলেও কলকাতা বা বিহারের দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল সফর করেননি। সময়টা ঠিক মনে নেই, তবে সেটা ছিল গান্ধীর

নোয়াখালী সফরের কাছাকাছি। আমি তখন কি কারণে জানি না কলকাতা এসেছিলাম। সে সময় দাঙ্গার তদন্তের ব্যাপারে আব্বার কুমিল্লা যাওয়ার কথা হলো। সেই সঙ্গে ফজলুর রহমান সাহেবসহ এক-দু'জন মন্ত্রীরও যাওয়ার কথা। তাঁরা যাবেন একটি সরকারী প্লেনে। আব্বার দৃষ্টিশক্তি তখন প্রায় ছিল না বললেই চলে, কাজেই তাঁর সাথে একজনকে যেতেই হতো। তাছাড়া ছোট প্লেনটির আসন সংখ্যা ছিল ছয়, কিন্তু যাত্রী তাঁরা তিনজন। এই অবস্থায় আমিও সেই প্লেনের যাত্রী হলাম। জীবনে আমার সেই প্রথম প্লেনে চড়া।

কুমিল্লায় পৌঁছে আমরা যে বাড়ীতে থাকলাম সেখানে অনেক লোক আসা যাওয়া করতে থাকলেন। তাঁদের মধ্যে একজনকেই মনে আছে। তিনি ছিলেন কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দেহলাভী। সুন্দর ও সদালাপী। বাড়ী তাঁর ছিল উত্তর প্রদেশে, কিন্তু চাকরীর পোস্টিং ছিল বাঙলায়। অনেকদিন পর তাঁর সাথে আবার দেখা হয় ১৯৬০ সালে অক্সফোর্ডে, আমি যখন সেখানকার ছাত্র। দেহলাভীর ছেলে ছিলো আমার সহপাঠী। সে সময় দেহলাভী ছিলেন রোমে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত, কিন্তু কয়েক সপ্তাহের জন্য এসেছিলেন ছেলের কাছে। তিনিও এক সময় ছিলেন অক্সফোর্ডে ব্রেসনোজ কলেজের ছাত্র, তাঁর ছেলেও ছিল ওই কলেজেই। তার নাম এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না, তবে নামের সাথে দেহলাভী ছিল। কলেজে তার কামরাতেই সিনিয়র দেহলাভীর সাথেও কথাবার্তা হতো। তিনি ছোটদের সাথেও মিশতে পারতেন ভালো। বোঝাই যেতো দারুণ আড্ডাবাজ লোক।

কুমিল্লায় আমরা যেদিন গেলাম তার পরদিনই ফিরলাম কলকাতায়, ঐ একই প্লেনে।

একত্রিশ

ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাথে বৃটিশ সরকারের যে চুক্তি হয়েছিল, সেটা পরিচিত হয়েছিল কেবিনেট মিশন প্ল্যান নামে। এই প্ল্যান অনুযায়ী ভারতকে তিনটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল A, B ও C-তে বিভক্ত করে একটি ফেডারেল কাঠামো প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনপক্ষের মধ্যে ঐক্যমত হয়েছিল। এর ফলে কংগ্রেস যেমন তার এককেন্দ্রিক (unitary) রাষ্ট্রের দাবী বাদ দিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় (federal) ব্যবস্থায় সম্মত হয়েছিল, তেমনি মুসলিম লীগও তার পাকিস্তান দাবী বাদ দিয়ে একটি সাধারণ কাঠামোর ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্বীকার করে নিয়েছিল।

এই চুক্তি অনুযায়ী একটি সংবিধান সভা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে বিস্তারিত ব্যবস্থা নির্ধারণ ও কার্যকর করার কথা ছিল। এই চুক্তি আসলে ১৯১৬ সালের লাখনৌ প্যাক্ট থেকে নিয়ে যত প্রকার চুক্তি বা আলাপ-আলোচনা কংগ্রেস-লীগের মধ্যে হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সব থেকে সন্তোষজনক ব্যবস্থা। এজন্য কেবিনেট মিশন প্ল্যান নামে এই চুক্তি সব মহলেই